আসন্ন নির্বাচন ও নাগরিক প্রত্যাশা

ড. বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (১৪ অক্টোবর, ২০০৮)

জাতীয় সংসদ ও উপজেলা নির্বাচন আসন্ন। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার ঘোষণা অনুযায়ী ১৮ ডিসেম্বর সংসদ এবং ২৪ ও ২৮ ডিসেম্বর উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। জাতির বৃহত্তর স্বার্থে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখতে হলে নির্ধারিত তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিকল্প নেই। অন্যথায় জাতি হিসেবে আমরা আরো বৃহত্তর সংকটে নিপতিত হবো। তাই আমাদের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা যে, সংশ্লিষ্ট সকলে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেবেন এবং ঘোষণামতো নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে তাদের করণীয় করবেন।

সৎ ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী চাই

আসন্ন নির্বাচনকে ঘিরে নাগরিক হিসেবে আমাদের প্রত্যাশা – নির্বাচনে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীরা মনোনীত হোক এবং তারা নির্বাচিত হবার সুযোগ পাক। আরো স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, নাগরিক হিসেবে আমরা সন্ত্রাসের গডফাদার, কালোবাজারি, কালো টাকার মালিক, দুর্নীতিবাজ, স্বার্থান্বেষী, প্রতারক, দখলদার, নারী নির্যাতনকারী, যুদ্ধাপরাধী, উগ্রবাদী, ধর্ম ব্যবসায়ী, দলবাজ ও ফায়দাবাজদেরকে নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে দেখতে চাই না। আশা করা যায় যে, এ সকল ব্যক্তিরা নির্বাচনী অঙ্গন থেকে বিদায় নিলে আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে একটি গুণগত পরিবর্তন ঘটবে এবং আমাদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সুসংহত হওয়ার পথ সুগম হবে।

বস্তুত, আমাদের আশংকা যে, সৎ, দক্ষ ও নিবেদিত ব্যক্তি তথা সজ্জনরা নির্বাচিত না হলে আমাদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চরম ঝুঁকির সম্মুখিন হবে। এমনকি রাষ্ট্রের ভবিষ্যতও হুমকির মুখে পড়বে। এছাড়াও দুর্বৃত্তরা নির্বাচিত হলে সমাজে দারিদ্র্য ও সাধারণ মানুষের প্রতি বঞ্চনা স্থায়ীরূপ লাভ করবে।

সজ্জনরা নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ না পাওয়া আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য চরম ঝুঁকিপূর্ণ, কারণ নির্বাচনই গণতন্ত্র নয়। উৎসবের আমেজে প্রতি পাঁচ বছর পর পর ট্রান্সপারেন্ট ব্যালট বক্সে ভোট প্রদানও গণতন্ত্র নয়। নিরাপত্তা বাহিনী পরিবেষ্টিত হয়ে অবাধে তা প্রদানের অধিকারকেও গণতন্ত্র বলা যায় না।

বস্তুত নির্বাচন গণতান্ত্রিক যাত্রাপথের সূচনা মাত্র। দুই নির্বাচনের মাঝখানে ক্ষমতাসীনরা কী-করেন, না-করেন তার ওপরই নির্ভর করে গণতন্ত্র কায়েম হওয়া। নির্বাচিতরা যদি ক্ষমতার অপব্যবহার না করেন, সততা-স্বচ্ছতা-সমতা-ন্যায়পরায়ণতা ও দায়বদ্ধতার সঙ্গে কাজ করেন, জনমত-মানবাধিকার ও আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন, শাসন প্রক্রিয়ায় জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেন এবং ব্যক্তি ও কোটারি স্বার্থের পরিবর্তে সমষ্টির স্বার্থ সমুন্নত রাখেন, তাহলেই গণতন্ত্র ও সুশাসন কায়েম হবে। কিন্তু আমাদের আশংকা যে, দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়নের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা নির্বাচিত হলে, তারা গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি মেনে চলবেন না এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় শাসনকার্যও পরিচালনা করবেন না। ফলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে, যা ঘটেছিল ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি। কারণ গণতন্ত্র কায়েম করতে হলে অন্যের, বিশেষত প্রতিপক্ষের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে অনুসৃত একটি অলিখিত আচরণবিধি মেনে চলতে হবে।

বিতর্কিত ব্যক্তিরা নির্বাচিত হলে তা রাষ্ট্রের ভবিষ্যতের জন্যও ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যদি দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়ন থেকে নিজেদের দূরে রাখতে না পারেন, তাহলে ইজারাতন্ত্র – অর্থাৎ লুটপাটের নিরঙ্কুশ অধিকার – আবারো প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আর এই ইজারাকে স্থায়ী করার জন্য অতীতের ন্যায় তারা পাতানো নির্বাচনের আয়োজন করতে, সকল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে দুর্বল করে তুলতে এবং পুরো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে আবারো অকার্যকর করে ফেলতে পারেন। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এমনি পরিস্থিতিতেই দ্বন্দ্ব, হানাহানি ও বিশৃঙ্খলতা সৃষ্টি হয় এবং উগ্রবাদের বিস্তার ঘটে ও রাষ্ট্রের কার্যকারিতাই দুর্বল হয়ে পড়ে। অতীতে এমনই ঘটেছিল এবং ভবিষ্যতে তা আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে বলে অনেকের আশংকা।

এছাড়াও দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নের ফলে সৃষ্ট অপশাসন গরিব মানুষদেরই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং তাদের প্রতি বঞ্চনা ও বৈষম্য আরো ভয়াবহ রূপ নেয়। ফলে ব্যাহত হয় দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রযাত্রা। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়া ১০০ ডলার মাথাপিছু আয় নিয়ে অর্থনৈতিকভাবে প্রায় একই অবস্থায় ছিল। গত ৩৭ বছরে বাংলাদেশের মাথপিছু আয় বেড়েছে প্রায় ৬ গুণ, পক্ষান্তরে দক্ষিণ কোরিয়ার বেড়েছে প্রায় ২০০ গুণ। প্রায় প্রাকৃতিক সম্পদবিহীন কোরিয়ার তুলনায় উর্বর মাটি, মিষ্টি পানি ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত বাংলাদেশেরই অনেক বেশি দ্রুতহারে উন্নত হওয়ার কথা ছিল! একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, গত ৩৭ বছরে বাংলাদেশের এক শ্রেণীর ব্যক্তিরা, যাদের অধিকাংশের বিরুদ্ধে লুটপাটের গুরুতর অভিযোগ রয়েছে, আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হলেও সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার তেমন কোন উন্নতি হয় নি, তাদের অনেকের এখনও নুন আনতে পান্তা ফুরায়। বলা বাহুল্য যে, এমনি পরিস্থিতিই উগ্রবাদের বিস্তারের জন্য উর্বর ক্ষেত্র তৈরি করে।

অতীতের অভিজ্ঞতা সুখকর নয়

সৎ ও যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত চারটি সিটি করপোরেশন ও নয়টি পৌরসভা নির্বাচনে আমাদের অভিজ্ঞতা ইতিবাচক নয়। এ সকল নির্বাচনের পূর্বে সজ্জনের পক্ষে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হলেও, বাস্তবে 'ভাল মানুষরা' উল্লেখযোগ্য হারে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামেন নি এবং অনেক বিতর্কিত ব্যক্তি নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন। নির্বাচিতদের অনেকে কারাগারে ছিলেন, অনেকের বিরুদ্ধে দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়নের অভিযোগে বহু মামলা রয়েছে, যদিও মামলা থাকা ও দোষী সাব্যস্ত হওয়া এক কথা নয়। যেমন, নয় জন নির্বাচিত সিটি ও পৌর মেয়রের বিরুদ্ধে ২৮টি মামলা বর্তমানে বিচারাধীন এবং তাদের কেউ কেউ আরো মামলা গোপন করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। তাদের অনেকে আয়কর পরিশোধ করেন না এবং আয়কর রিটার্নে প্রদত্ত তাদের জীবনযাত্রার মান সম্পর্কিত তথ্য (যেমন, মাসিক বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল,

মাসিক পারিবারিক খরচ ইত্যাদি) অবিশ্বাস্য রকমের কম। এছাড়াও নির্বাচিতদের অনেকের শিক্ষাগত যোগ্যতা অল্প, যদিও অল্প প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বা নিরক্ষতা কোনভাবেই অযোগ্যতা নয়। উপরন্তু, নির্বাচিত মেয়র ও সাধারণ আসনের কাউন্সিলরদের ৮০ শতাংশের অধিক ব্যবসা তাদের পেশা বলে হলফনামায় দাবি করেছেন। ব্যবসায়ীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে অবশ্য কোন দোষ নেই, তবে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় যখন রাজনীতির সিঁড়ি বেয়ে তারা ব্যবসায়ী হন। তাই এ কথা বলা যায় যে, গত আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত সিটি ও পৌর নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের গুণগত মানে তেমন কোন পরিবর্তন ঘটে নি।

বিতর্কিত ব্যক্তিদের নির্বাচিত হওয়ার পেছনে সম্ভাব্য অনেক কারণ রয়েছে। একটি কারণ হলো, ১১ জানুয়ারি, ২০০৭ তারিখের পর অনেক ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগে মামলা দায়ের এবং তাদের অনেককে কারাগারে অন্তরীণ করা হলেও, আমাদের রাজনীতিতে দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়নের বিরুদ্ধে কোনরূপ গণপ্রতিরোধ গড়ে ওঠে নি। অনেকেই ১১ জানুয়ারির পূর্বাবস্থায় – অর্থাৎ রাজনৈতিক হানাহানিতে – ফিরে না যাওয়ার কথা বললেও, হানাহানির মূল কারণ, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের বিরুদ্ধে তেমন সোচ্চার হন নি। ফলে কলুষিত রাজনীতির বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গড়ে ওঠে নি এবং অভিযুক্তরা সামাজিকভাবে ধিকৃতও হন নি। এর অন্যতম কারণ অবশ্য দেশের জনমত সৃষ্টিকারী ব্যক্তিবর্গের অধিকাংশের দলীয় আনুগত্য এবং দলবাজির উর্ধ্বে উঠতে না পারা। এদের অনেকে দলীয় পক্ষপাতিত্বই শুধু প্রদর্শন করেন নি, তারা পরিবর্তনকামীদের রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর অপচেষ্টায়ও লিপ্ত হয়েছেন। এ সকল কারণেই দুর্বৃত্তদের মধ্যে কোন অনুশোচনা বা লজ্জাবোধ সৃষ্টি হয় নি, যা তাদেরকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রাখতে পারতো। অর্থাৎ, ১১ জানুয়ারি ২০০৭ তারিখের ঘটনার পর বড় বড় কিছু নেতা-নেত্রীদেরকে, যাদেরকে কোনভাবে স্পর্শ করা যাবে না বলে অনেকের ধারণা ছিল, কারাগারে অন্তরীণ করার মত চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটলেও, জাতির মানসিকতায় তেমন পরিবর্তন ঘটে নি। ফলে পরবর্তীতে অভিযুক্তদের অনেককে, এমনকি তাদের কিংপিনদের বা মূল হোতাদেরকেও মুক্তি দিতে হয়েছে এবং হচ্ছে। সরকারের অনেক অনৈতিক পদক্ষেপও, যা তাদেরকে ক্রমাগতভাবে দুর্বল করেছে, বর্তমান অবস্থার জন্য বহুলাংশে দায়ী।

এছাড়া আমাদের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিও এমন পর্যায়ে পৌঁছে নি যে, কোনরূপ গর্হিত কাজের সাথে সম্পৃক্ত থাকার সুস্পষ্ট অভিযোগে অভিযুক্তরা স্বেচ্ছায় জনপ্রতিনিধিত্বমূলক বা অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়াবেন এবং নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবেন। আর বিতর্কিত ব্যক্তিরা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ফলে অনেক সৎ ও যোগ্য প্রার্থীরা এগিয়ে আসেন নি। অর্থাৎ সাম্প্রতিক নির্বাচনে 'গ্রাসামস্ ল' কাজ করেছে – 'খারাপ' প্রার্থীরা 'ভাল' প্রার্থীদেরকে নির্বাচনী ময়দান থেকে বিতাড়িত করেছে।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোও বিতর্কিত প্রার্থীদেরকে নির্বাচন থেকে দূরে রাখতে পারে নি। যেমন, সরকার অনেকের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নের মামলা করেছে, কিন্তু এ সকল মামলাগুলো নিস্পত্তি করতে পারে নি। অনেকের মতে, এক্ষেত্রে বিচার বিভাগের ভূমিকাও চরমভাবে বিতর্কিত। নির্বাচন কমিশনও মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি আরোপ করতে পারে নি এবং হলফনামায় অসত্য তথ্য দেয়ার কিংবা তথ্য গোপন করার জন্য মনোনয়নপত্র বাতিল করে নি। এছাড়াও কমিশন হলফনামা ও আয়কর রিটার্নের কপি প্রকাশের ব্যাপারে গাফিলতি করেছে। যেমন, আমরা 'সুজনে'র পক্ষ থেকে বহু কাঠখড় পোড়ানোর পর মাত্র নির্বাচনের আগের দিন বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের রিটার্নিং অফিসারের কাছ থেকে প্রার্থীদের আয়কর রিটার্নের তথ্য পাই, তাও সে তথ্য ছিল আংশিক। ফলে তথ্যগুলো গণমাধ্যম ও ভোটারদের কাছে যথাসময়ে পৌঁছানো সম্ভব হয় নি। এছাড়াও 'সুজন' ব্যতীত অন্য কোন সংগঠন প্রার্থীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে ধারাবাহিকভাবে এগুলো বিতরণের এবং এর মাধ্যমে ভোটার সচেতনতা সৃষ্টির কোনরূপ উদ্যোগ নেয় নি। গণমাধ্যমের জন্যও ছিল এটি প্রথম অভিজ্ঞতা, তাই তাদের পক্ষেও গভীর অনুসন্ধানী রিপোর্ট তৈরি করা অনেকক্ষেত্রে সম্ভবপর হয় নি।

এ প্রসঙ্গে রাজনৈতিক দলের ভূমিকাও ছিল অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। তারা দুর্নীতিবাজ ও দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে কোনরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয় নি। বরং তারা দুর্বৃত্তায়নের অভিযোগে কারারুদ্ধ ব্যক্তিদেরকেও মনোনয়ন ও সমর্থন প্রদান করেছে। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, রাজনৈতিক দলের উদ্যোগী ভূমিকা ছাড়া রাজনীতিকে কলুষমুক্ত করা অসম্ভব।

বিতর্কিত ব্যক্তিদের নির্বাচিত হওয়ার পেছনে সম্ভবত সবচেয়ে বড় কারণ আমাদের বিদ্যমান সামন্তবাদী সংস্কৃতি। সামন্তবাদী সংস্কৃতির কারণে আমাদের দেশে বর্তমানে একটি পেট্রন-ক্লায়েন্ট সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে, যা রাজতন্ত্রের অধীনে রাজা-প্রজার সম্পর্কের সমতূল্য। স্বাধীন রাষ্ট্রের 'নাগরিক' হিসেবে জনগণ রাষ্ট্রের মালিক এবং সংবিধান অনুযায়ী সকল ক্ষমতার উৎস। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত স্বাধীনতার ৩৭ বছর পরও দেশের অধিকাংশ জনগণ, বিশেষত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী রাষ্ট্রের 'মালিকে' পরিণত হতে পারে নি – তারা এখনও প্রভূতুল্য শাসকদের করুণার পাত্রই রয়ে গিয়েছে। ফলে যে সকল নাগরিক অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা তাদের স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্য, তা তারা পায় না। তাদের ন্যায্য অধিকারগুলো অর্জনের জন্য তাদের পেট্রনদের আশ্রয় নিতে হয়। বস্তুত, পেট্রন বা পৃষ্ঠপোষকদের কৃপা বা অনুগ্রহের কারণেই তারা বিভিন্ন ধরনের বৈধ-অবৈধ সাহায্য-সহযোগিতা পেয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, পৃষ্ঠপোষকরা তাদেরকে নিরাপত্তাও প্রদান করে থাকে এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের হয়রানি থেকে রক্ষা করে। অনেকের কাছেই তারা হয়ে পড়েছেন আপদে-বিপদে সাহায্যকারী 'আপনজন'। এভাবে বিভিন্ন ধরনের ফায়দা দেয়ার মাধ্যমে আমাদের দেশে রাজনীতিবিদরা ও তাদের মাস্তানরা পরিণত হয়েছেন নব্য প্রভূতে। আবার তারা রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে প্রতিপক্ষকে হয়রানিও করে। নির্বাচনের সময় সাধারণ মানুষ নিজ স্বার্থের বিবেচনায় 'যৌক্তিকভাবেই' সে সকল রাজনীতিবিদ বা পেট্রনদেরই ভোট দেয় যারা তাদেরকে বেশি সুযোগ-সুবিধা ও নিরাপত্তা প্রদান করে, যদিও রাষ্ট্রের মালিক হিসেবে তাদের এ সিদ্ধান্ত জাতীয় স্বার্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তাই ভোট দেয়ার ক্ষেত্রে প্রার্থীদের সততা ও যোগ্যতার বিবেচনা সাধারণ ভোটারদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। সদ্যসমাপ্ত সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনেও তাই হয়েছে – ভোটাররা ফায়দা প্রদানকারী তাদের নব্য প্রভূদেরকেই ভোট দিয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

কার কী করণীয়

আসন্ন জাতীয় সংসদ ও উপজেলা নির্বাচনে সৎ ও যোগ্য প্রার্থীদেরকে নির্বাচিত হয়ে আসার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়ার ক্ষেত্রে অনেকেরই বিশেষ করণীয় রয়েছে। এ ব্যাপারে সরকারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তবে এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। সচেতন নাগরিক সমাজেরও এ বিষয়ে অনেক কিছু করার রয়েছে।

আমাদের সংবিধান অনুযায়ী, "নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সংসদ সদস্যগণের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যেরূপ সাহায্য ও সহায়তার প্রয়োজন হইবে, নির্বাচন কমিশনকে সেইরূপ সকল সম্ভাব্য সাহায্য ও সহায়তা প্রদান করিবেন।" (অনুচ্ছেদ ৫৮ঘ(২)) শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে উপজেলা নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমিশনকে সহায়তা করাও সরকারের দায়িত্ব। তাই আসন্ন নির্বাচনে কালো টাকার মালিক ও পেশিশক্তির অধিকারীরা তথা দুর্বৃত্তরা যাতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়ে নির্বাচনী ফলাফলকে প্রভাবিত করতে না পারে সেদিকে সরকারকে কঠোরভাবে দৃষ্টি দিতে হবে। একইসাথে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা রোধে সরকারকে আগে থেকেই কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সরকারকে সকল ক্ষেত্রে প্রশ্নাতীতভাবে নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করতে হবে।

জরুরি ক্ষমতা বিধিমালা ২০০৭ এর ১১(৫) ধারা অনুযায়ী এই বিধিমালার অধীনে দণ্ডপ্রাপ্তরা জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকারসহ কোন নির্বাচনেই অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। দণ্ডের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করেও তারা তা পারবেন না। কিন্তু অন্যান্য প্রচলিত আইনে দণ্ডপ্রাপ্তদের আপিল দায়ের করে অতীতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। আমাদের উচ্চ আদালতের রায় এ ব্যাপারে অস্পষ্ট। তবে আইনজ্ঞদের মতে, নিম্ন আদালতের দণ্ডের বিরূদ্ধে আপিল করলেই হবে না, দণ্ডপ্রাপ্ত সম্ভাব্য প্রার্থীকে এ ব্যাপারে আদালতের কাছে আবেদন করতে হবে এবং তাকে ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৬১(ক) ও ৪২৬ ধারার আওতায় দোষী সাব্যস্ত হওয়া ও সাজার বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ পেতে হবে। (মাহমুদুল ইসলাম, *কনস্টিটিউশনাল ল অফ বাংলাদেশ*, ২য় সংস্করণ, পৃ ৩৪২) আমরা আশা করেছিলাম যে, সকল অস্পষ্টতা দূরীকরণের লক্ষ্যে দণ্ডপ্রাপ্তদের, আপিল দায়ের সত্ত্বেও, নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার সুযোগ না রাখার বিধান সংশোধিত গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। দুর্ভাগ্যবশত নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নি। সরকারও এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নেয় নি। এ ধরনের বিধান আমাদের রাজনীতিকে কলুষমুক্ত করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতো বলে অনেকের ধারণা। উল্লেখ্য যে, প্রতিবেশী ভারতে একবার দণ্ডপ্রাপ্ত হলে আপিল করা সত্ত্বেও কেউ নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারে না, যদিও সংসদ সদস্যদের বেলায় তার ব্যতিক্রম রয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা আশা করি যে, সরকার বিচারাধীন মামলাগুলো নিষ্পত্তি করার ব্যাপারে জরুরিভিত্তিতে উদ্যোগ গ্রহণ করবে, যার মাধ্যমে কিছু দণ্ডপ্রাপ্ত দুর্বৃত্তদের নির্বাচন থেকে দূরে রাখা সম্ভব হবে। তবে নিশ্চিত করতে হবে যে, বিচার প্রক্রিয়া যেন স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ হয় এবং অভিযুক্তরা যেন ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত না হন।

ভবিষ্যতে অবশ্য গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আদালত কর্তৃক চার্জশীটভুক্ত হলেই নির্বাচনে অংশগ্রহণে অযোগ্য ঘোষণা করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। এর ফলে আইন ভঙ্গকারীরা আইন প্রণয়নকারী হওয়ার সুযোগ পাবেন না। উল্লেখ্য যে, ভারতীয় নির্বাচন কমিশন এমনি একটি সুপারিশ তাদের ২২ দফা সংস্কার প্রস্তাবে উল্লেখ করেছিল। তাদের যুক্তি হলো যে: "The Commission is of the view that keeping a person, who is accused of serious criminal charges and where the Court is *prima facia* satisfied about his involvement in the crime and consequently framed charges, out of electoral arena would be a reasonable restriction in greater public interests. There cannot be any grievance on this. However, as a precaution against motivated cases by the ruling party, it may be provided that only those cases which were filed prior to six months before an election alone would lead to disqualification as proposed. It is also suggested that persons found guilty by a Commission of Enquiry should ... stand disqualified from contesting elections." (www.eci.gov.in) জম্মু ও কাশ্মীরের 'রিপ্রেজেনটেশন অফ পিপল এক্ট'-এ এমনি একটি বিধান রয়েছে।

আমরা আশা করি যে, উপজেলা নির্বাচন হবে। কিন্তু নতুন উপজেলা অধ্যাদেশ নিয়েও আমাদের গুরুতর আপত্তি রয়েছে। গত ৩০ জুন জারি করা অধ্যাদেশ অনুযায়ী শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট এলাকার অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও পৌরসভার মেয়রগণ উপজেলা পরিষদের সদস্য হবেন। অর্থাৎ জনগণের সরাসরি ভোটে কোন ব্যক্তি উপজেলা পরিষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ পাবেন। ফলে উপজেলা পরিষদ মূলত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের নিয়ন্ত্রিত একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে, যা প্রশাসনের সকল স্তরে পরস্পরের নিয়ন্ত্রণমুক্ত সায়ত্তশাসিত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সৃষ্টির ধারণার সাথে সম্পূর্ণ অসঙ্গতিপূর্ণ। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ ধরনের উপজেলা 'চেকস্ এন্ড ব্যালেন্সেস' বিবর্জিত একটি অকার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে।

সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অর্থবহ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচনী আইন ও বিধি-বিধানগুলোকে পরিপূর্ণ ও কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। গত দু'টি নির্বাচন কমিশন এ ব্যাপারে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এক্ষেত্রে বর্তমান নির্বাচন কমিশনের ভূমিকাও প্রশ্নবিদ্ধ। যেমন, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সিটি করপোরেশন ও পৌরসভার নির্বাচনে প্রার্থীতা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কমিশন চরম শিথিলতা প্রদর্শন করেছে, যার ফলে অনেক বিতর্কিত প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ও নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। এছাড়াও কমিশন প্রার্থীদের প্রদত্ত হলফনামা ও আয়কর রিটার্ন যথাযথভাবে বিচার-বিবেচনা করে তথ্য গোপনকারী বা অসত্য তথ্য প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে তড়িৎ ব্যবস্থা

নিতে ব্যর্থ হয়েছে, যদিও এ ব্যাপারে আদালত থেকে একটি নির্দেশনা জারি করা হয়েছিল। এমনকি কমিশন প্রার্থীদের প্রদত্ত তথ্যগুলো যথাসময়ে প্রকাশও করতে পারে নি। এছাড়াও কমিশন মনোনয়নপত্র প্রত্যাহরের পর শুধুমাত্র চূড়ান্ত প্রার্থীদের তথ্য প্রকাশ করছে, মনোনয়নপত্র জমা দেয়া সকল প্রার্থীর নয়। উপরন্তু নির্বাচন পরবর্তীকালে বেশ কয়েকজন নির্বাচিত প্রতিনিধির বিরুদ্ধে তথ্য গোপনের গুরুতর অভিযোগ উঠলেও, কমিশন অদ্যবধি এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সক্ষম হয় নি।

আশা করি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন কমিশন ভবিষ্যতে আরো কার্যকর ও সাহসি ভূমিকা রাখবে। আশার কথা যে, গত ১৪ সেপ্টেম্বর একদল সচেতন নাগরিকের সাথে বৈঠকের প্রেক্ষিতে কমিশন প্রার্থীদের তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মনোনয়নপত্র জমাদানকারী সকল প্রার্থীর প্রদত্ত হলফনামা, নির্বাচনী ব্যয়ের উৎসের বিবরণী ও আয়কর রিটার্নের কপি মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার সাথে সাথে সেগুলো প্রকাশ করা যার অন্যতম। আশা করি, কমিশন এ সিদ্ধান্ত পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করবে এবং যথার্থ যাচাই-বাছাইয়ের পর অসত্য তথ্যপ্রদানকারী ও তথ্য গোপনকারীদের মনোনয়নপত্র বাতিল করবে। একইসাথে আমরা দাবি করছি যে, নির্বাচন কমিশন গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের বিধানগুলো – শুধু আক্ষরিক অর্থেই নয়, এর চেতনাও – পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করবে। আমরা অতীতের মতো সাক্ষী গোপাল নির্বাচন কমিশন দেখতে চাই না!

অতীতের নির্বাচনগুলোতে অবাধে টাকার খেলা চলেছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সিটি করপোরেশন ও পৌর নির্বাচনেও অবৈধ লেনদেন ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে বলে অভিযোগ উঠেছে, যদিও তা বহুলাংশে গোপনে ঘটেছে। আমাদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে কলুষমুক্ত করতে হলে নির্বাচনে টাকার প্রভাব দূরীভূত করার এবং নির্বাচনী ব্যয় আইনে নির্ধারিত সীমার মধ্যে রাখার কোন বিকল্প নেই। নির্বাচন কমিশনকেই এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে। এ ব্যাপারে নির্বাচনী ব্যয় গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণের জন্য অডিটর নিয়োগ করা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, ১৯৯৩ সালে অন্ধ্র প্রদেশ, কর্ণাটক ও সিকিমের প্রাদেশিক নির্বাচনকালে প্রার্থীদের দৈনন্দিন নির্বাচনী ব্যয় মনিটরিং-এর লক্ষ্যে টিএন সেশনের নেতৃত্বে ভারতীয় নির্বাচন কমিশন এমনইভাবে অডিটর নিয়োগ করেছিল। প্রসঙ্গত, প্রার্থীদের হলফনামা ও আয়কর রির্টানে প্রদত্ত তথ্য যাচাইয়ের জন্য প্রতি নির্বাচনী এলাকায় দু'জন অফিসার নিয়োগ করা হবে বলে আমাদের নির্বাচন কমিশন সম্প্রতি যে ঘোষণা দিয়েছে, সে অফিসারগণই নির্বাচনের সময় অডিটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন। এছাড়াও নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে এবং রির্টানিং অফিসারদের পরিচালনায় নির্বাচনী ব্যয়হ্রাসের লক্ষ্যে প্রজেকশন মিটিং-এর আয়োজন করা যেতে পারে।

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাত্র দু'মাস বাকী। এই সময় রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে দায়িত্বশীল আচরণ সকলের কাম্য। আমরা আশা করি যে, আর কালক্ষেপণ না করে দলগুলো নির্বাচন কমিশনের অধীনে নিবন্ধিত হবে, যাতে তারা একটি আইনী কাঠামোর মধ্যে আসে। নিবন্ধনের ফলে দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র চর্চার পথ সুগম হবে, দলের আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে এবং দলের প্রাথমিক সদস্যদের কাছে দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত হবে। দলের নিবন্ধনের ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন এরইমধ্যে অনেক বড় ধরনের, এমন কি অনাকাঙ্ক্ষিত পর্যায়ের ছাড় দিয়েছে এবং আরো ছাড় দেয়ার জন্য কমিশনের ওপর চাপ দেয়া কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। আশা করি যে, আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ত্যাগ করে নির্বাচনী প্রস্তুতিতে নেমে পড়বে।

দলের সাথে সম্পৃক্ত সন্ত্রাসী ও দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে কোন দলই এখন পর্যন্ত ব্যবস্থা নেয় নি। আশা করি, তারা এ ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা নেবে। আমরা আরো আশা করি যে, তারা চিহ্নিত দুর্বৃত্তদের, আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত হোক আর না হোক, মনোনয়ন দেবে না। তারা মনোনয়ন বাণিজ্য এবং এ ধরনের অনৈতিক কর্ম থেকে বিরত থাকবে। তারা তৃণমূলের দলীয় সদস্যদের সুপারিশের ভিত্তিতে চূড়ান্ত মনোনয়ন দেবে। আমাদের প্রত্যাশা যে, দলগুলো সম্ভাব্য প্রার্থীদের কাছ থেকে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করবে এবং কতগুলো সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ মানদণ্ডের ভিত্তিতে মনোনয়ন প্রদান করবে। আমাদের আরো প্রত্যাশা যে, দলগুলো প্রার্থীদের প্রদত্ত তথ্য এবং মনোনয়নের মানদণ্ড ও তা কীভাবে প্রয়োগ হয়েছে সে তথ্য জনসম্মুখে প্রকাশ করবে। সর্বোপরি, নাগরিক হিসেবে আমাদের আকাঙ্খা যে, আইনে অন্তর্ভুক্ত সংস্কারগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলো পরিপূর্ণ আন্তরিকতার পরিচয় দেবে, কারণ তাদের সদিচ্ছার ওপরই আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভবিষ্যত সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল।

সৎ ও যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সচেতন নাগরিক ও সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলোরও অনেক করণীয় রয়েছে। তারা সৎ ও যোগ্য প্রার্থীর পক্ষে সোচ্চার হতে পারেন এবং সজ্জনদেরকে মনোনয়ন প্রদানের লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারেন। তারা প্রার্থীদের প্রদত্ত তথ্য ভোটারদের কাছে পৌছে দিতে পারেন, যাতে ভোটাররা জেনে-শুনে-বুঝে সুজনে'র পক্ষে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। রাজনৈতিক সংস্কার আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রেও সচেতন নাগরিক ও প্রগতিশীল সংগঠনগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

পরিশেষে, আমাদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রেখে এটিকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় এবং রাষ্ট্রে সুশাসন কায়েম করতে হলে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক ঘোষিত নির্ধারিত দিনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কোন বিকল্প নেই। নির্বাচনকে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণ ও অর্থবহ করার মাধ্যমে আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের গুণগত মানে পরিবর্তন ঘটানোর এবং আমাদের রাজনীতিকে কলুষমুক্ত করার ক্ষেত্রে সরকার, নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক দল এবং সচেতন নাগরিকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তবে, এক্ষেত্রে বর্তমান সময়ে রাজনৈতিক দলের সদাচরণ ও দায়িত্বশীল ভূমিকা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। দুর্বৃত্ত ও বিভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত বিতর্কিত ব্যক্তিরা নির্বাচিত হয়ে যেন গণতন্ত্র ও দেশের ভবিষ্যতকে বিপন্ন করতে না পারে, এজন্য তাদেরকে নির্বাচনী প্রক্রিয়া থেকে দূরে রাখতে হবে এবং সৎ, দক্ষ ও জনকল্যাণে নিবেদিত ব্যক্তিদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোকে এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। আশা করি, সংশ্লিষ্ট সকলেই এ ব্যাপারে যথাযথ ভূমিকা পালন করে আমাদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সামনে এগিয়ে নেবেন।